Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.17- 30
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অনঙ্গমোহিনীর কাব্যভাবনা

মৌমিতা পাল
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিব্রু কলেজ, ডিব্রুগড়, আসাম, ভারত

Abstract:

This paper explores the contours of Anangamohini Devi's poetry and traces the growth of her poetic art since the publication of Kanika – her first collection of poetry – which came out in 1899. She has an important place in Northeast India's Bengali literature, particularly in the genre of poetry, in the early twentieth century. However, despite her early contribution into the field of poetry, Anangamohini Devi's works are not adequately explored and – except a few compilations – the conventional history of Bengali literature has more or less remained silent about her writings. It is within this context that the paper reflects on her hitherto unexplored poetic techniques of her works.

অনঙ্গমোহিনী দেবীর (১৮৬৪-১৯১৮) কাব্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা'র মধ্য দিয়ে। অনঙ্গমোহিনী ছিলেন ত্রিপুরার রাজকন্যা। তাঁর পিতা ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য (১৮৩৯-১৮৯৬)। মহারাজার উৎসাহে কন্যা অনঙ্গমোহিনী কাব্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। প্রথাগত শিক্ষাপ্রাপ্ত অনঙ্গমোহিনী ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ লাভ করে নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ পান। স্বামী গোপালকৃষ্ণের (?-১৯০৫) সাহচর্যও ছিল উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতে অনঙ্গমহিনীর বহু কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। অনঙ্গমোহিনী দেবীর কাব্যগ্রন্থ সংখ্যা মোট তিনটি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা' (১৮৯৯) পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গ করেছেন। ১৯০৫ সালে স্বামীর মৃত্যুতে শোকাহত হৃদয়ের করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কাব্যগুলিতে। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শোকগাথা' (১৯০৬) স্বামীর চরণে উৎসর্গীকৃত। 'প্রীতি' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর হৃদয়ের আকুতি জগত-স্বামীর প্রতি নিবেদন করেছেন। স্বামী গোপালকৃষ্ণের মৃত্যুতে কবির গভীরভাবে শোকাহত হন অনঙ্গমোহিনী। তাঁর শোক সন্তপ্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত ভাবনা নিবিষ্ট হয়েছে শেষের কাব্য দুটিতে। বিষয় অনুযায়ী অনঙ্গমোহিনীর উক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রেম বিষয়ক কবিতা: অনঙ্গমোহিনীর কবিতাগুলিতে তাঁর গভীর প্রেমভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রেম কখনো মিলনের জন্য আকুল, কখনো বিরহ-বেদনায় কাতর:

উথাল আমার রোদনে বেদনে
কেবলি ত ভালবাসা।[১] ('আমার সুখ')

প্রেমের অসীম সমুদ্রের মধ্যে তিনি নিজের জীবনকে 'ক্ষুদ্র দ্বীপ' সম মনে করেন। হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গকে সমুদ্রের প্রশান্তিতে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছেন। কবিতায় কবি লিখছেন:

প্রেমের সাগরে ডুবে আমি গলে যাই—
প্রেম হয়ে প্রেম মাঝে থাকি[২] ('প্রেম সিন্ধু')

'নীরব প্রেম' কবিতাটিতে কবির প্রেমিক সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবির অন্তরে নিরবধি প্রেমধারা বয়ে গেছে। তাঁর নীরব প্রেমের ভাষা স্বপ্নের মোহে আচ্ছন্ন:

নিরজনে নিশা করে নীরব প্রেমের মেলা[৩] ('নীরব প্রেম')

কবি সেই নীরব প্রেমের মোহতেই ডুবে থাকতে চেয়েছেন। কবিহৃদয়ের ইন্দ্রিয়ঘন রূপ সঞ্চারিত হয়েছে। অনুভূতির মিশ্রভাব প্রকাশ পেয়েছে:

'একি মিশ্রিত সুখ ? অমৃত গরল?
কাঁদি কেন সুখে মাতিয়া?
এ যে দাহন করিয়া করিছে শীতল;
করিছে মুক্ত বাঁধিয়া।'[৪] ('অদৃষ্ট প্রেম')

উল্লেখিত, কবিতার উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে প্রচলিত চিত্রকল্পের বিপরীত মেরুর অবস্থান লক্ষণীয়। এ ধরনের অলংকারকে বিরোধাভাস বলা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে oxymoron; যা অনির্বচনীয়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, বিরোধাভাস তাই প্রকাশের চেষ্টা করে। প্রেমের আপ্লুত অবস্থা ভক্তির অনির্বচনীয় রহস্য অথবা আত্মবিরোধী মনোভাব প্রকাশের জন্য কবি এ ধরনের অলঙ্কারের আশ্রয় নেন, যা প্রচলিত কল্পমূর্তির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। প্রচলিত চিত্রকল্প পাঠকের মনে কোনো সঙ্গতিকরণের প্রয়োজনবোধ জাগ্রত করে না। কিন্তু বিরোধাভাস সঙ্গতিকরণের প্রক্রিয়াকে ডেকে আনে, অথচ কোনো যুক্তি সঙ্গত বাস্তবধর্মী প্রথায় সঙ্গতিতে পৌঁছানো যায় না। হেরে গিয়ে পাঠক তখন অতীন্দ্রিয় বা অবিদ্যার জগতে সমাধান খোঁজেন।

প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা: প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানবমনে বিচিত্র ভাবনার উন্মেষ ঘটায়। দিনের প্রতি প্রহরই নব নব ভাবে কবি হৃদয়কে উদ্বেলিত করে ভাবুক করে তোলে। কবি অনঙ্গমোহিনীর প্রকৃতি চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলিতে। ঊষার বন্দনায় কবি লিখেছেন:

'লভি নবীন জীবন সুখে পাখিকূল
করিছে ঊষার আরতি,
আজি হইয়ে বিভোর মধুর মধুর
গাইছে ললিতে প্রভাতী।[৫] ('ঊষা')

প্রভাতী সুর কবি হৃদয়ে আশার সঞ্চার ঘটিয়েছে। প্রখর মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে শরতের আকাশে নিস্তব্ধ প্রকৃতির বর্ণনায় লিখছেন:

স্তব্ধ নীরব দিক, প্রচণ্ড তপন,
রহি রহি তপ্ত শ্বাস ফেলে সমীরণ;
প্রখর মধ্যাহ্ন বেলা দীপ্ত চারিদিক,
নিঝুম প্রকৃতি সতী স্তব্ধ অনিমিখ![৬] ('মধ্যাহ্ন')

কবি প্রাণভরে প্রকৃতির রূপ আস্বাদন করেছেন। শুধু প্রভাতী গান কিংবা শরতের মধ্যাহ্নের ভাবই তিনি ব্যক্ত করেননি। ঋতু পরিবর্তনের অপ্রতিহত প্রভাব কবি-চিত্তে দোলা দেয়। হেমন্ত নিশীথের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন:

গভীর হেমন্ত নিশি জোছনা প্লাবিত দিগি,
প্রকৃতি নিদ্রায় নিমগণ,
চাঁদের অমিয় মাখা, নীহারের জালে ঢাকা
তরুলতা বন-উপবন।[৭] ('নিশীথ সঙ্গীত')

বর্ষার রূপ বর্ণনায় কবি লিখছেন:

বরিষার আর্দ্রময় তীব্র স্নিগ্ধ রাতে,
কেতকী কুসুম গন্ধ আসে দূর হতে;
শাঙনের ঘনঘটা, আঁধার আকাশ,
বহে শুধু পূরবের উন্মাদ বাতাস;[৮] ('বর্ষা')

বসন্তকে সম্বোধন করে লিখেছেন:

এস ঋতুরাজ,
অনিলের রথ ভরি, চন্দন গন্ধে-
পীত কিশলয়, কেতন দোলায় মন্দে।[৯] ('বসন্ত')

বসন্তের ঊষার বর্ণনায় কবির উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে:

কামিনী তরুর শাখে বসিয়ে কোকিল ডাকে,
মুহুর্মুহু কুহু কুহু তানে,
যামিনী পোহায়ে যায় দোয়েল প্রভাতী গায়
কুসুমিত লতার বিতানে।[১০] ('বসন্ত ঊষায়')

প্রকৃতির চিত্ররূপময় বর্ণনায় কবি লিখেছেন:

সন্ধ্যা যায় ধীরে ধীরে আইল যামিনী
নিবিড় আঁধার,
সুনীল বসনে পুন
সাজিছে প্রকৃতি রাণী,
গলেতে পরিয়ে তারা-হার[১১] ('সান্ত্বনা')

এই চিত্রময়তার মধ্যেও কবি হৃদয় বেদনার্ত হয়ে ওঠে। ক্লান্তি নামে। তিনি লেখেন:

দিবস রজনী কত আর,
ভাবিব রে মন?
ক্ষণেক ভুলিতে দাও হৃদয় বেদন![১২] ('সান্ত্বনা')

বসন্তের জ্যোৎস্না রাত কবি মনকে ভাবুক করে তোলে। মুগ্ধ কবি লেখেন:

'বসন্ত জোছনা রাতি উজল চাঁদের ভাতি,

মৃদু মন্দ বহে সমীরণ;
তটিনী পিয়াস প্রাণে বহিছে সাগর পানে,
ভাসি যায় চাঁদের কিরণ।'[১৩] ('বসন্ত জ্যোৎস্নায়')

প্রকৃতির আনন্দঘন মুহূর্ত কবিহৃদয়ে নানা ভাবনার উদ্রেক করেছে। কবির সৌন্দর্যের অনুভব প্রকাশ পেয়েছে কবিতাগুলিতে।

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক: বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাজপরিবারে জন্ম অনঙ্গমোহিনীর। বৈষ্ণব প্রেমধর্মের আবেগে আপ্লুত অনঙ্গমোহিনী রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কতগুলি পদ রচনা করে আপন কাব্যপ্রতিভাকে বিকশিত করেছিলেন। ভাবের দিক থেকে পদগুলিতে মিলনের উন্মাদনা, বিরহের অসহনীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাত্ম প্রেম-সাধনায় মগ্ন রাধিকার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে কবির 'শ্রীরাধার পূর্বরাগ' পদটিতে:

(কার) পরশের অনু পবনেতে তনু
পরশিয়া উলমিল?
(ওগো) দেখি নাই যারে, সে কি না আমারে
পাগল করিয়া দিল।[১৪] ('শ্রীরাধার পূর্বরাগ')

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসারের পদগুলি অপরূপ রস সঞ্চার করে। কবি অনঙ্গমোহিনীও কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে সেই রস আস্বাদন করেছেন। রাধা-কৃষ্ণের মিলনের আয়োজনে ব্রজরমণীরা কুঞ্জবন আলোকিত করে তুলেছে ফুলসজ্জায়। 'দুহু প্রেম গাথা'র তান দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্যামের মধুর বাঁশি সুর পুলক সঞ্চার করে। কবির বর্ণনায়:

রাধাময় বেণু বাজাইছে কানু।
মৃদু সুললিত সুরে,
পুলকিত হিয়া গাইছে পাপিয়া
সুমধুর সমধুরে।[১৫] ('মিলন')

প্রেমে আবিষ্ট রাধা কৃষ্ণ-মিলনে আত্মহারা। রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ কল্পনায় কবি মন পুলকিত হয়ে ওঠে। রাধা-কৃষ্ণের মিলন মুহূর্তের বর্ণনায় কবি লিখছেন:

দলিত অঞ্জন
গঞ্জিত করবী
তাহে মালতীর মালা,
মাধবের চির
হৃদয় বাসিনী
বৃষভানু রাজবালা।[১৬] ('যুগলরূপ')

অভিসারের মিলনানন্দের সমস্ত সুর থেমে যায় বিরহ পর্বে এসে। চিরবিরহিনী রাধিকার সকরুণ আবেগে বিরহ পদগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অনঙ্গমোহিনী রাধিকার অন্তর্বেদনাকে কাব্যে সঞ্চারিত করেছে। কৃষ্ণ বিহনে শ্রীরাধার বিরহ যন্ত্রণাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন কবি। কৃষ্ণ দর্শনে অধীর রাধার কর্ণে বাঁশীর সুর অহরহ তাঁকে ডাকে। কবির ভাষায়:

'গাঁথি বিরহিণী বালা মালা ফুল কলিতে

আপখিয়া, পথ-পানে চাহে গো।
কাঁদে রাধা ওগো বধূ, শুধু কেন ছলিতে
মধু বনে তব বাঁশী গাহে গো ?'[১৭] ('বাঁশী')

প্রেমিকের বিচ্ছেদে কাতর মন প্রকৃতির বৈচিত্র্যে উদাসী হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতির (১৩৮০-১৪৬০) পদে রাধার-বিরহ ভাব প্রগাঢ়। তিনি লিখেছেন, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর'[১৮] প্রবল বর্ষার রাতে কৃষ্ণ-মিলনে ব্যাকুলতা অনুভব করে শ্রীরাধা। বিদ্যাপতির সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ করা অনঙ্গমোহিনীর। রাধার বেদনার্ত আকুল হৃদয়ের ভাব বর্ণনায় তিনি লেখেন:

'আজি এ বাদর নিশা
আঁধিয়ারা ভরা দিশা।
বরখে নিরদ ঘন বারি—'

সজনি কাহার লাগি
রহিনু যামিনী জাগি,
নাহি মম নীদ নয়ানে—[১৯] ('বর্ষায়')

বৈষ্ণবপদের 'বিরহ' চিরবিরহের। প্রেমের তীক্ষ্ণ শর তাই রাধিকার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। কবির বর্ণনায়:

সখি, কানুর বিরহ
নিদারুণ শর
রহিল মরমে পশি;[২০] ('বিরহ')

বিরহ-মূলক কবিতা: টেনিসন তাঁর শোককাব্য In Memoriam-এ লিখেছিলেন

And hush'd my deepest grief of all, / when fill'd with tears that cannot fall, / I brim with sorrow drowning song.[২১]

ব্যক্তিজীবনের গভীর শোক কবির কণ্ঠরোধ করলে, তিনি গানে ডুবে যান। বেদনার ভারে কবি অনঙ্গমোহিনীও আশ্রয় খুঁজেছেন গীতিকবিতায়:

অতৃপ্ত প্রাণের মম বিরহের স্মৃতি!
কবিতার রূপে এই বেদনার গীতি![২২] ('সমদুঃখিনীর প্রতি')

ভালোবাসার পরিণতিতে বেদনার অনুভব কবিহৃদয়কে বিস্মান্বিত করেছে:

প্রেমের পশ্চাৎ কেন বিরহ বেদন;
হাসির সহিত হায়! জড়িত রোদন।[২৩] ('ভালোবাসার পরিণাম')

যন্ত্রণাকাতর হৃদয় নিয়ে কবি লিখছেন:

দুখের করাল করে
ছিন্ন প্রেম পুষ্প ঝরে,
বহিছে প্রবলতর

শোকের বাতাস![২৪] ('বিরহে')

কবিমন অসম্ভব জেনেও প্রেমিকের দর্শন অভিলাষে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বেদনার অশ্রু দিয়ে সমস্ত বন্ধন শিথিল করে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থ আশায় ডুবে কবি শুধু তার স্বরূপকেই কল্পনা করেছেন চারপাশে:

কক্ষমাঝে হেরি-তব প্রতিকৃতি খানি খালি—
চক্ষে ভাসে ছায়া মাখা রেখা।[২৫] ('প্রতিকৃতি')

টেনিসন তাঁর কাব্যে মৃত্যু প্রসঙ্গে লেখেন:

'And on the depths of death there swims
The reflex of a human face.'[২৬]

মৃত্যুর গভীরতায় ভাসে মানুষের মুখের প্রতিচ্ছবি। যে প্রেম ফিরবে না, কবি সেই শোকে বিহ্বল। বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁর অন্তরে অনন্ত শূন্যতা এনেছে। প্রেমময় স্মৃতি কবি হৃদয়ে সততই সঞ্চারমান। কবির ভাষায়:

আছি তারে সদা ভালবেসে,
তাহা বিনা এ সংসারে, আর কিছু চাহি নারে
হউক সে অশরীরি নিরাধারময়,
তবু সে জীবনে মম ভুলিবার নয়।[২৭] ('সমদুঃখিনীর প্রতি')

'নিশীথে' কবিতায় চির বিরহের ভাব প্রকাশ পেয়েছে:

সুখ রবি চির অস্তাচলে!
দিবস যামিনী মোর, কেবলি আঁধার ঘোর
আঁধার আমার চিরোজ্জ্বল রবি,
স্মৃতি-দরপনে শুধু ভাসে শোক-ছবি![২৮] ('নিশীথে')

'গিয়াছে' কবিতায় কবি তাঁর বিরহ যন্ত্রণা থেকে লেখেন:

গেছে চলে মোরে একাকিনী হেথা
আঁধারের মাঝে রেখে।[২৯] ('গিয়াছে')

প্রিয়-বিচ্ছেদে কবি জীবন আঁধারময়। 'সুদীর্ঘ তামসী নিশা'য় আচ্ছন্ন। একাকী জীবন, উদ্দেশ্যবিহীন পথ চলায় কবির হৃদয়ে ক্লান্তি নামে। কবির ভাষায়:

জানি না তরণী হায়, কোথা মোরে নিয়ে যায়,
চলিতেছি উদ্দেশ্য বিহীন[৩০] ('তরী যাত্রা')

প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্র্য কবির হৃদয়ের সুপ্ত বেদনা গভীরভাবে জাগ্রত করে। বর্ষা, বসন্ত চিরকালই কবি হৃদয়ে বেদনা জাগায় ও প্রেমিকের শরীরি বিচ্ছেদ প্রেমিকার মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করে। অনঙ্গমোহিনীর কবিতায়ও বর্ষার-বিরহ ভাব আমরা লক্ষ করি:

ব্যাকুলিত মন, ঝরে দুনয়ন,
আজি শুধু তার স্মরণে,[৩১] ('বর্ষা নিশায়')

কবির কাছে বর্ষার রাত বিষাদে মলিন হয়ে ওঠে। অতীতের সুখস্পর্শ কবিমনের বেদনাকে তীব্রতর করে তোলে।

আজি ব্যাকুল বাতাস
দামিনী বিকাশে,
গরজে বারিদ ঘোর;
ওগো বরষার গানে
আজিকে পরাণে,
জাগে কি হুতাশ মোর![৩২] (‘বর্ষায়’)

প্রিয় বিরহ শোক কবির ‘মরণ’ কবিতায় দেখা যায়:

সুখ-তরু আনন্দ-কাননে,
ভালবাসা-ফুলদলে সুধাসিক্ত প্রেম-ফলে,
স্নেহ প্রীতি মধুর আননে;
হায় মৃত্যু কেন তুই তথা
নয়ন পলকে,
জ্বেলে দিস্ দাবানল ঝলকে ঝলকে।[৩৩] (‘মরণ’)

কবি জগতের সুখ, সজীবতা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতা বোধ করেছন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কবিকে নিরাশায় আচ্ছন্ন করে:

নিরাশা-পবণে জ্বলি’ দুঃখানল, শিখা তুলি
যায় এই হৃদয় দহিয়া।[৩৪] (‘বিষাদে’)

তবু কবি স্মৃতি আঁকড়ে নিরাশ সাধনাতেই মজে থাকতে চেয়েছেন:

আজি নিরাশায় ওগো কি ভাষায়
কাঁদিয়া জানাব যাতনা?
যাক রাতি যাক জীবন পোহাক
(করি—) বিজনে নিরাশ সাধনা।[৩৫] (‘নিরাশায়’)

কবির নিরাশ মনের ভাব একাধিক কবিতায় প্রকাশিত। প্রিয় বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় কবি অন্তরের বিনোদবীণার তার ছিন্ন:

নাহি এবে প্রেম ভালবাসা প্রীতি
রহিয়াছে শুধু যাতনা ভার!
বাজে না প্রাণের প্রেমময় গীতি
বিনোদ বীণার ছিঁড়েছে তার![৩৬] (‘কল্পনা’)

ইহজন্মে প্রেমের মানুষের সঙ্গে চিরবিরহে কবি শোকাচ্ছন্ন। এই বিরহ তাঁর দেহ-মন-আত্মাকে বিধ্বস্ত করে। তাই বিরহ থেকে মুক্তির জন্য মৃত্যুর পরে তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেছেন। ‘পেয়েছি’ কবিতায় কবির পাওয়া তাই মৃত্যুর ওপারে:

এ পারে কভু পাব না খুঁজে।
যবে জীবন-সাঁঝে—
ওপারে যাব চক্ষু বুজে,

উদিবে তুমি কাছে।[৩৭] ('পেয়েছি')

মৃত্যু চেতনা ও দার্শনিকতা: কবির মৃত্যুচেতনা তাঁকে জীবনের প্রতি প্রশ্নমুখী করে তোলে। কবি অন্তরের সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে উপলব্ধি করেন যে:

মরণের অন্তরালে,
মণ্ডিত কিরণ-জালে,
আছে দেশ উজল ভবন;

তথা সব অমর জীবন—
নাহি মরণের শোক,
নাহি বিরহের দুখ,
তথা চির মহান মিলন;
প্রতি নিশা উদে তথা মধু পূরণিমা,
কভু নাহি করে ম্লান অমা মলিনীমা।[৩৮] ('মৃত্যু')

মৃত্যু-পরবর্তী এক নব জীবনের প্রতি কবির বিশ্বাস ছিল। তিনি লিখেছেন, 'জীবনের পর পারে আছে নব দেশ—/চির বিভাময়, নাহি মলিনতা লেশ।'[৩৯] মলিনতাবিহীন বিহীন ওই অসীমলোকই কবির একান্ত কাঙ্ক্ষিত। বস্তুজগতের বিরহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পিয়াসী কবি লিখছেন:

চাহি না জাগিতে এজগতে আর,
অসীম যাতনা ল'য়ে।

এস চির ঘুম, মোহ-মন্ত্রে মোর,
ঢেকে দেও আখি তারা![৪০] ('চিরঘুম')

ভয়ানক জেনেও কবি আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন মৃত্যুকে। কবি লিখেছেন,

'এস মৃত্যু চির সুপ্তি বেশে;
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়,
পরশি মোহিয়ে মোরে সাথে করি নিয়ো।[৪১] ('মৃত্যু')

অনঙ্গমোহিনীর মৃত্যু চেতনা এসেছে তাঁর 'মরণ' কবিতায়

এস ওগো, এস এস আমার মরণ।
এস হে সুন্দর সৌম্য, সুনীল বরণ।[৪২] ('মরণ')

কবির অন্তিম আশা ঘুঘু সকাতরে ডেকে তাঁকে ঘুম পাড়ানের গান শোনাবে। অতি দূর-দূরে থাকি / ডাকি ঘুঘু সকাতর।/ ঘুম পাড়াবার গান,/ শুনাইবে শুধু মোরে।/চির ঘুমে যবে প্রাণ/হ'ইয়ে আসে অচেতন/মুদিয়ে আসিবে যবে,/ক্লান্ত মোর দু-নয়ন[৪৩] ('অন্তিম বাসনা') 'ঘুঘু' এখানে হয়ে উঠেছে চিরশান্তির প্রতীক।

জীবনের অবসানকালে কবি অতীতের সুখস্মৃতিচারণ করে বাস্তবের বেদনা থেকে পরিত্রাণের আশা করেন,

একদা ফুরাবে যবে, দীর্ঘ তপ্ত-বেলা
সমস্ত জীবন শেষে, করি সাঙ্গ খেলা
বিরাম লভিবে প্রাণ, সে সময়ে স্মৃতি,

আসি তুমি ঢাল কানে, অতীতের গীতি!
জাগাও সে ছবি হৃদে অস্তিমেতে মোর
অবশেষে চোখে দিয়ো মোহ-ঘুম-ঘোর![৪৪] (‘চিরস্মৃতি’)

কবি প্রত্যক্ষ করেন জীবনপ্রবাহের চলিষ্ণুতা। কালস্রোতের দ্রুত গতিতে সকলেই ভেসে চলে যায়। কবির দার্শনিক মনের প্রকাশ ঘটেছে এখানে:

কাল স্রোতে ভেসে যাই।
নববর্ষ পানে চাই,
যতখানি ডুবি তাই গনি আনিবার—
যত খানি থাকে বাকী
কেমনে তা ধরে রাখি ?
প্রবাহে যে যাবে চলি, আসিবে না আর।[৪৫] (‘বর্ষ’)

‘তরী-যাত্রা’ কবিতায় কবি লিখেছেন:

জীবন-সাগর মাঝ, ভাসিয়া চলিছে আজ
ভাঙা চোরা ক্ষুদ্র মম তরী;[৪৬] (‘তরী-যাত্রা’)

‘জীবন-সাগর’ অর্থে বিরাটত্বের মধ্যে নিজের অস্তিত্বভাবনা ক্রিয়া করেছে কবির মধ্যে। তিনি অনুভব করেছেন কালস্রোতের বহমানতায় চলমান জীবনতরীর বুদ্বুদটকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অবশেষে:

একদা আঁধার নীরে, ভাঙা তরী ধীরে ধীরে,
ডুবে যাবে নীরবে নীরবে,
মিশিবে জলেতে যেন, জলের বুদ্বুদ হেন,
চিহ্ন তার কোথা নাহি রবে![৪৭]

‘নিশীথে’ কবিতায় অলংকারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কবির কাছে জীবনের অবসাদ কখনো সমুদ্রের মতো উত্তাল, কখনো বা ক্ষীণ অগ্নিশিখা, কখনো আবার সূর্যাস্ত:

অতল নৈরাজ্যময় উথলে হৃদয় পারাপার
ভাবনা তরঙ্গ রাশি আছাড়িয়া পড়ে বার বার।

ক্ষীণ শিখা দীন যথা বাতাসের ভর নাহি সহে।
নিমেষে নিবিয়া যায় অবশেষ কিছু নাহি রহে।

পলে পলে জীবনের দিক শেষ হয়ে আসে ধীরে
জীবন তপন ক্রমে ডুবে যায় দূরান্তের তীরে।[৪৮] (‘নিশীথে’)

‘অশরীরী জাগরণ’ কবিতায় ক্ষণিকের জন্য যন্ত্রণা ভুলে কবি লেখেন:

বিফল নহেরে আশার বাঁধন
অলীক নহেরে সাধনা।
সুখ তরঙ্গে ধুয়েছি অঙ্গ
মুছিয়া ফেলেছি যাতনা।[৪৯] (‘অশরীরী জাগরণ’)

'সাধনা' কবিতায় কবি নারীজীবনের দুঃখ জয়ের কথা বলেছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে মুক্তির দিশা দিয়েছেন:

...প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা।[৫০] ('সাধনা')

'বাসনা' কবিতায় কবি কল্পনার মনোরথে সুখের নাগাল পেতে চেয়েছেন:

'কল্পনা মনোরথেতে জুড়িব,
যাব সুখ-যার গাহনে।'[৫১] ('বাসনা')

'নববর্ষ' কবিতায় কবি অনঙ্গমোহিনী ব্যক্তিগত শোক ভুলে স্নেহের স্পর্শ অনুভব করেছেন:

কে তুমি নিকট আসি,
শোক তাপ দুঃখ নাশি।
স্নেহ উৎস দিয়াছ খুলিয়া?
আঁধার নিখিলে মম,
পূর্ণিমার শশী সম
স্নিগ্ধ আলো দিতেছ ঢালিয়া।[৫২] ('নববর্ষ')

নতুন বছরের নতুন উন্মাদনায় কবিমন সাড়া দিয়েছে। দুঃখ-বিরহের যন্ত্রণা সাময়িক ভুলে কবি আলোর স্পর্শে নবসঞ্চার লাভ করেছেন। ব্যক্তিগত দুঃখ থেকে মুক্তির প্রয়াস ছিল টেনিসনের কাব্যেও লক্ষ করি। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তিনি লিখেছিলেন:

Ring in the nobler modes of life,
With sweeter manners, purer laws
....
Ring in the love of truth and right,
Ring in the common love of good.[৫৩]

অনঙ্গমোহিনীর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, বিরহ ও মৃত্যু চেতনা প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবীয় ধ্যান ধারণার প্রভাব লক্ষ করা যায় তাঁর কাব্যসাধনায়।

কবির প্রকৃতিমূলক কবিতায় নারী ও প্রকৃতি মিশে আছে। প্রকৃতি তাঁর কাছে 'সতী'। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

'নিঝুম প্রকৃতি সতী স্তব্ধ অনিমিখ'[৫৪] ('মধ্যাহ্ন')

'নিঝুম নিশীথ গীতি/গাইছে প্রকৃতি সতী,/বাষ্পময় আকুল নয়ান!'[৫৫] ('নিশীথ সঙ্গীত')

'যেনরে প্র কৃতি সদা সজল নয়নী/পতির বিরহে যথা সতী সীমন্তিনী'[৫৬] ('বর্ষা')

'আজি ঢাকিছে তপন/ মলিন বরণ,/ যেন গো প্রকৃতি সতী।'[৫৭] ('বর্ষায়')

অনঙ্গমোহিনীর কবিতায় অলংকারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি আদি অলংকার প্রয়োগে তাঁর কাব্য সৌন্দর্যময় করেছে।

উপমা অলংকারের উদাহরণ:

'দলিত কুসুম সম শীর্ণ দেহ-লতা'[৫৮] ('মহাশ্বেতা')

এখানে উপমেয় 'দেহ', উপমান 'কুসুম' সাধারণ গুণ 'দলিত', শীর্ণ, তুলনাবাচক শব্দ সম। পূর্ণোপমার উদাহরণ।

সমাসোক্তি অলংকারের উদাহরণ:

'সুনীল বসনে পুন/ সাজিছে প্রকৃতি রাণী'[৫৯] ('সান্ত্বনা')

'আসিবেরে চির সন্ধ্যা/ আঁধারে ধরি কর'[৬০] ('অন্তিম বাসনা')

প্রকৃতির সুনীল বসনে সেজে আসা কিংবা আঁধারের হাত ধরে সন্ধ্যার আসায় অচতনের উপমেয়র প্রতি চেতন মানবী ধর্মই আরোপিত হয়েছে।

নিদর্শনা অলংকারের উদাহরণ:

'সীমাহীন প্রাণ ছেপে, শব্দহীন স্তব্ধ ভাষা/আছে পক্ষ বিস্তারিয়া; বক্ষে মৌন ভালবাসা'[৬১] ('নীরব প্রেম')

শব্দহীন স্তব্ধ ভাষার পক্ষ বিস্তার সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যঞ্জনা দ্বারা উপমেয়-উপমান ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'শব্দহীন স্তব্ধ ভাষা'-র মাধ্যমে কবি যা মানসিকভাবে অনেক প্রসারিত তাই বোঝাতে চেয়েছেন। অতএব এটি নিদর্শনা অলংকার।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ:

'আজি নিশি যেন, / বিরহিণী হেন/বিষাদ মলিন বরণী।'[৬২] (বর্ষা নিশায়')

এখানে উপমেয় 'নিশি' উপমান 'বিরহিণী'। সংশয় সূচক শব্দ 'যেন'। নিশিকে বিরহিণে বলে প্রবল সংশয় হয়। তাই এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার।

বিরহ-বেদনার করুণ রস অনঙ্গমোহিনীর কবিতার মূলসুর। ব্যক্তিজীবনের শোকের ঝড়ে দিশেহারা কবিহৃদয় মুক্তির সন্ধান করেছেন। দৃঢ় চিত্তে কবি ঘোষণা করেছেন—

'এই জড় ধরা রুদ্ধ এ আলয়, / ভাঙ্গিব সংগ্রামে যুঝিয়া; / লভি সে সমরে প্রীতির বিজয়/ লইব সে দেশ খুঁজিয়া।[৬৩] ('বাসনা')

বেদনার ভারে কবির জীবন 'আঁধার ঘোর', 'দুঃখানল'-এ দাহ্যময়, কখনো দিশাহীন 'ভাঙা তরী'।

পতি বিরহের মর্মগাথা কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) শোককাব্য 'অশ্রু-কণা' (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থেও লক্ষণীয়। কবি লিখেছেন, 'এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।/ এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।/ এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।/ এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন!'[৬৪]

অনঙ্গমোহিনীর বিষাদঘন অনুভূতির প্রকাশ হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। 'বিষাদ' শব্দটির প্রয়োগও অধিক পরিলক্ষিত হয় তাঁর কবিতায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

'বিরহ বিষাদ মগনা'[৬৫] ('উষা')

'বিষাদ ব্যাকুলা বালা, আধ বিমুদিত আঁখি'[৬৬] ('মহাশ্বেতা')

'বিষাদ করুণ স্বরে, /কে যেন কাদিছে ধীরে/ আলপিয়ে বেহাগ রাগিনী।'[৬৭] ('নিশীথ সঙ্গীত')

'নিশার নিলীমা সনে/মিশিয়ে বিষাদ মনে/নিভিতেছে তারকার পাঁতি'[৬৮] ('বসন্ত উষায়')

'বিষাদ আকুল প্রাণে।'[৬৯] ('বিরহ')

'বিষাদ বরষা ঝরে'[৭০] ('উপহার')

'কেবলি বিষাদময় সেই শেষ স্মৃতি।'[৭১] ('চিরস্মৃতি')
'বিশ্ব যেন বিষাদে মগন'[৭২] ('স্বপ্ন')
'রয়েছে বেদনা বিষাদে লীন'[৭৩] ('কল্পনা')
'বিরহের ঝটিকায়, /নিবিয়া যেতেছে হায়! /আশা-দীপ উজল আমার! /
ডোবো ডোবো জীর্ণ-তরী, /বিষাদ সাগর'পরি,/উথলে তরঙ্গ নিরাশার!'[৭৪] ('তরী যাত্রা')

'বিষাদে হৃদয় ভরি; /পরাণে আকুল করি, / বেলা মোর হয়ে গেছে শেষ!'
'আমার হৃদয়ভরা বিষাদ আঁধারে আজি-/এ জগতে রহিয়াছে ছেয়ে।'[৭৫] ('বিষাদে')

অনঙ্গমোহিনীর কবিতায় একাধিকবার 'আঁধার' এবং 'রবি' উপমার প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্ত:
'নীরব আঁধার জীবন-আকাশে, / নাহি উদে রবি উজল বেশে;'[৭৬] ('নীরব')

'দিনমণি অস্ত যায়'[৭৭] ('আঁখিজল')
'সুখ রবি চির অস্তাচলে!'[৭৮] ('নিশীথে')
'আঁধারে আবরি হিয়া,/ গেছে মম রবি চির তরে!'[৭৯] ('দিবা অবসান')
'নীরব আঁধার জীবন-আকাশে, /নাহি উদে রবি উজল বেশে; [৮০] ('নীরব')
'বিদুরি আঁধার প্রেমের তপন/ উদিবে বিশ্ব ঝলিয়া।'[৮১] ('বাসনা')

'বিষাদ', 'রবি', আঁধার শব্দগুলির বহুল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি অন্তরের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কবির জীবনের আকাশে 'রবি' হ'ল তাঁর প্রিয়তম, যা 'চির অস্তচলে' নিমগ্ন। প্রিয়-বিরহে কবির জীবনে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তা কবি হৃদয়ে বিষাদের চরম কারণ হয়ে ওঠে। কবির কাছে মিলনে-বিরহে অবিনশ্বর তাঁর প্রেম। তাই লিখেছেন, 'মিলনে—নয়ন মাঝে, একই মুরতি রাজে,/এক ঠাই সমীপেতে রয়;/বিরহে—অসীমরূপ, হৃদয়েতে রহে গাঁথা,/ শুধুই জগতরূপময়।'[৮২] অনঙ্গমোহিনীর কবিতায় নিরাশাই প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি লিখেছেন 'ফুরায়েছে প্রীতি আর বিরহের মেলা'[৮৩] কামনাহীন হৃদয় নিয়ে কবি কণ্ঠে যেন 'কাতরতা ঝরে' গেছে। বস্তুজগতের মায়া, দুঃখ-শোকে আচ্ছন্ন কবির ভাব।

তথ্য ও সূত্রনির্দেশ:

১। সেনগুপ্ত স্বপন, (সম্পা.), 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা', পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃ. ১০০
২। তদেব, পৃ. ১০৭
৩। তদেব, পৃ. ৯৭
৪। তদেব, পৃ. ১০০
৫। তদেব, পৃ. ২১
৬। তদেব, পৃ. ২৬
৭। তদেব, পৃ. ২৬
৮। তদেব, পৃ. ৩০
৯। তদেব, পৃ. ১২২
১০। তদেব, পৃ. ৩০
১১। তদেব, পৃ. ৫১

১২। তদেব, পৃ. ৫২
১৩। 'তদেব, পৃ. ৮২
১৪। 'তদেব, পৃ. ১১১
১৫। তদেব, পৃ. ৩৯
১৬। তদেব, পৃ. ৪১
১৭। তদেব, পৃ. ১২৩
১৮। শ্রীদিব্যসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) 'বৈষ্ণব পদাবলী', কলকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, (১৯৩২) পৃ. ৪১
১৯। স্বপন সেনগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
২০। তদেব, পৃ. ৩৬
২১। Alfred Lord Tennyson, In Memoriam, Cambridge Press, New York, 1895, p. 22
২২। স্বপন সেনগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
২৩। তদেব, পৃ. ৫৭
২৪। তদেব, পৃ. ৬৫
২৫। তদেব, পৃ. ১২৪
২৬। Alfred Lord Tennyson, Ibid, p. 132
২৭। স্বপন সেনগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
২৮। তদেব, পৃ. ৬৭
২৯। তদেব, পৃ. ১০৩
৩০। তদেব, পৃ. ৮৬
৩১। তদেব, পৃ. ৫৫
৩২। তদেব, পৃ. ৭৯-৮০
৩৩। তদেব
৩৪। তদেব, পৃ. ১১৬
৩৫। তদেব, পৃ. ১১৯
৩৬। তদেব, পৃ. ৬৯
৩৭। তদেব, পৃ. ৯৮
৩৮। তদেব, পৃ. ৭৩
৩৯। ঐ
৪০। তদেব, পৃ. ৮৫
৪১। তদেব, পৃ. ৭৪
৪২। তদেব, পৃ. ১১৫
৪৩। তদেব, পৃ. ৩৫
৪৪। তদেব, পৃ. ৫৪
৪৫। তদেব, পৃ. ১১৪,
৪৬। তদেব, পৃ. ৮৫
৪৭। তদেব, পৃ. ৮৬
৪৮। তদেব, পৃ. ১০৫
৪৯। তদেব, পৃ. ১০৪-১০৫

৫০। তদেব, পৃ. ৯৬
৫১। তদেব, পৃ. ৯৯
৫২। তদেব, পৃ. ১১৯
৫৩। Alfred Lord Tennyson, Ibid, p.129
৫৪। স্বপন সেনগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
৫৫। তদেব, পৃ. ২৭
৫৬। তদেব, পৃ. ৩০
৫৭। তদেব, পৃ. ৭৯
৫৮। তদেব, পৃ. ২৪
৫৯। তদেব, পৃ. ৫১
৬০। তদেব, পৃ. ৩৪
৬১। তদেব, পৃ. ৯৬
৬২। তদেব, পৃ. ৫৪
৬৩। তদেব, পৃ. ৯৯
৬৪। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, ‘অশ্রু-কণা’ উদ্ধৃত, গিরিন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮০
৬৫। স্বপন সেনগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
৬৬। তদেব, পৃ. ২৪
৬৭। তদেব, পৃ. ২৭
৬৮। তদেব, পৃ. ৩০
৬৯। তদেব, পৃ. ৩৬
৭০। তদেব, পৃ. ৪৬
৭১। তদেব, পৃ. ৫৩
৭২। তদেব, পৃ. ৫৯
৭৩। তদেব, পৃ. ৬৮
৭৪। তদেব, পৃ. ৮৬
৭৫। তদেব, পৃ. ১১৬
৭৬। তদেব, পৃ. ৭৬
৭৭। তদেব, পৃ. ৪৭
৭৮। তদেব, পৃ. ৬৭
৭৯। তদেব, পৃ. ৭১
৮০। তদেব, পৃ. ৭৬
৮১। তদেব, পৃ. ৯৯
৮২। তদেব, পৃ. ৯০
৮৩। তদেব, পৃ. ১২৫